আলোকিত প্রজন্মের জন্য চাই মানবিক শিক্ষা

মোতাহার হোসেন

আমাদের পরিবারে, সমাজে, সংসারে ,আমাদের চলনে বলনে,রীতি নীতিতে,আচার আচারণে পরিবর্তন আসছে। তেমনি পরিবেশ ,প্রকৃতি,ঋতুবৈচিত্রেও আসছে পরিবর্তন। মানুষ.সমাজ সংসার, প্রকৃতির মতো বদলাচ্ছে মানুষের মন মানসিকতা,আচার আচরণ। কিন্তু সব সময় পরিবর্তন বা বদল প্রত্যাশিত হয়না। প্রযুক্তির এই যুগে তথা বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কারের এই সময়ে আমাদের হাজার বছরের লালিত ঐতিয্য,রীতি নীতিতে পরিবর্তনটা অপ্রত্যাশিত হলেও অবশ্যাম্ভী। আর এ কারণে আমাদের মধ্যে সম্পর্কেও যে বন্ধন তা অকেনটা বালির বাধের মতো। এ পর্যায়ে এই শতকের তরুন তরুনী,কিশোর কিশোরী প্রযুক্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে নিজেদের সমাজ,সংসার,পরিবারের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে বেরিয়ে একাকীত্ব,এক ঘরে হয়ে যাওয়ার দিকে ঝুঁকছে। এসব কিশোর কিশোরী,.তরুণ তরুণী পিতা মাতা,আতŔীয় স্বজন,প্রতিবেশী থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকছে। এক ঘরে থেকেও যেন তারা অন্য গ্রহের বাসিন্ধা। তখন তাদের কাছে বন্ধু বান্ধবরাই হয়ে ওঠে। এখানে কবি বিনয় মুখোপাধ্যায় (যাযাবর) দৃষ্টিপাত কবিতার একটি উক্তি প্রণিদান যোগ্য,'' "আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েস।" ঠিক অনুরুপ সম্ভাবনাময় আমাদের নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তি সাময়িক আনন্দ দিলেও দীর্ঘস্থায়ী বিষাদে ঢেকে যায় তাদের জীবন,ধীরে ধীরে তারা একাকীত্ব জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে একাকীত্ব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে আতŔহননের মধ্যদিয়ে। সাম্প্রতিক কালে কিশোর কিশোরী,তরুণ তরুণির মধ্যে আতŔহনন,আতŔহত্যার প্রবনতা বেশী এ কারণেই।

প্রযুক্তির আসক্তি এবং আতŔকেন্দ্রীক জীবযাপনের কারণে শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ক্ষতিকর এবং মানসিক বিকারগ্রস্ততা পেয়ে বসে। এ বিষয়টি মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক এক গবেষণায় উঠে এসেছে এ রকম তথ্য। সারাদেশে ঘটে যাওয়া আত্মহত্যার হার ভীষণ উদ্বেগজনক। 'আত্মহত্যা' এখন 'নীরব মহামারি' হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে। এটিও যে মহামারির মতো একটি প্রতিরোধের বিষয় নিয়ে এখনও তেমন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছেনা।

এটা সত্য যে, সাম্প্রতিক সময়ে অভিভাবকরা নিজেদের নিয়ে ভাববার যেমন সময় পাচ্ছেন না; তেমনি সন্তানদের রুটিন মাফিক করণীয় ছাড়া মানবিক,সামাজিকতা,লৌকিকতার শিক্ষা দিচ্ছেনা। সন্তানের মনোজগতে প্রবেশের জন্য, তাদের বোঝার জন্য এবং তাদের মানসিকতার বিকাশের ব্যবস্থা হচ্ছেনা। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের মেধার বিকাশ ঘটাতে উদ্যমী, কিন্তু মনোজগতের উন্নতি নেই নজর। সন্তানরা বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞায় সবার চেয়ে উর্ধ্বে থাকবে এটাই প্রত্যাশা। বস্তুত, আবেগ,বিবেক এবং প্রযুক্তির সমন্বয়ে যদি নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলা যায় তাহলে সমাজে শিশু কিশোর, তরুণ তরুণীদের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

আবার সন্তানদের সঙ্গে বাবা-মার আবেগি এবং মানবিক,আন্তরের বন্ধনের দিকটি অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমান সময়ের অভিভাবকদের মা-বাবারা যেভাবে তাদের প্রতিপালন করতেন, ঠিক একইভাবে তাদের সন্তানদের পরিচালনা করতে চান। এভাবেই বর্তমানে অভিভাবকত্ব চলছে। আগে যৌথ পরিবারে সন্তানরা মা-বাবার পাশাপাশি অন্যান্য সদস্যের পাশে পেত। এখন মা-বাবাকেই সন্তানরা কাছে পায় না , তখন একমাত্র সঙ্গী হয় মোবাইল ডিভাইস। নতুন প্রজন্মের একাকীত্বে থাকার এটাও একটা কারণ ।

তাছাড়া কভিড-১৯-এর মতো অতিমারি, কিংবা ডেঙ্গুর প্রকোপ মানুষের কাছে যেমন সহসাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে; 'আত্মহত্যা' তেমনটা হয় না। গত দুই বছরে করোনা বা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশে যে সংখ্যক মানুষ মারা গেছে, তারচেয়ে অনেক বেশি মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক জরিপে দেখা গেছে, করোনাকালীন ১০ মাসে মহামারিতে ৫ হাজার ও একই সময়ে আত্মহত্যায় ১১ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এটা সত্যযে,প্রযুক্তি মানুষকে সহজ ও সমৃদ্ধ করেছে। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় মানুষের জীবনে এসেছে নবদিগন্ত। তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে বিশ^ এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। পৃথিবী পরিণত হয়েছে বিশ্বগ্রামে। প্রযুক্তি সব সময় সাফল্যই বয়ে আনে না, ক্ষতিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রযুক্তির অপব্যবহারে নতুন প্রজন্ম বিপথগামী হচ্ছে,অন্যের সঙ্গে মেলা মেশা,সামাজিকতার সুযোগ থাকছেনা। অথচ একসময় শিশুদের শৈশব ছিল প্রাণোচ্ছলতায় ভরপুর.অবসের মএঠ ঘাটে হৈহুল্লুড় করে সময় কাটাতো। বর্তমান প্রজন্মের কাছে বিষয়টি হাস্যকর। এখন নতুন প্রজন্মকে গ্রাস করেছে মোবাইল, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, ইমো, ফেসবুক।

বর্তমান সময়ে মা-বাবা ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্কের অস্থিরতা, দূরত্ব আর মান-অভিমান বেড়ে যাওয়া তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ার বড় কারণ। এর মূলে রয়েছে প্রজন্মগত ব্যবধান। এটি হলো প্রজন্মান্তরে চিন্তা, ধারণা, ভাবমূর্তি, বিশ্বাস ও প্রচলিত সামাজিক রীতি নীতির পার্থক্য। এ বিষয়টি একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলেও সামাজিক বা বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এটিকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলা চলে। অর্থাৎ প্রজন্মগত ব্যবধান থাকবেই। আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এমন কিছু উপাদান তৈরি হয় যেগুলো সামাজিক অস্থিরতা, সমাজের মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে এবং তা যদি বেশি সময় স্থায়ী হয়, তখনই নিজের ক্ষতি করার প্রবণতায় বেড়ে পরিনতিতে আত্মহত্যার পথে ধাবিত হয়।

আগের দিনের শিশুরা যে আবেগিক এবং সামাজিক,পারিবারিক ও মানবিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠত, এখন তা পারছে না। আবেগের বশবর্তী হয়ে তারা নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। অভিভাবকদেরও এ থেকে উত্তরণের আদর্শ গন্তব্য অজানা।

অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব, এবং মানবিক ও সামাজিকত শিক্ষার পরিবর্তে শুধু কেতাবি শিক্ষা,বই আর বই এর মধ্যে সন্তানদের বন্দী করায় পরিস্থিতির অবনিত হচ্ছে । যা সমাজ রাষ্ট্র ,পরিবার কারো জন্যই মঙ্গল জনক নয়। নতুন প্রজন্মকে গ্রাস করছে সাময়িক ব্যর্থতা,হতাশা। এই ব্যার্থতা হতাশায় ভেঙ্গে না পড়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়াই হবে উৎকৃষ্ট পথ। তাহলেই সাফল্যের সোনার কাঠি হাতে আসবে। আগের দিনের শিশুরা যে আবেগি বন্ধনের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠত, এখন তা পারছে না। আবেগের বশবর্তী হয়ে তারা নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। অভিভাবকদেরও এ থেকে উত্তরণের আদর্শ পথ অজানা। এ জন্য অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা,সন্তাদের প্রতি আরো বেশী মনোযোগ দেয়া দরকার। একই সঙ্গে অভিভাবকদের উচিত তাদের সন্তানদের শৈশব থেকেই সামাজিতা,মানবিক মূল্য বোধ,দেশ প্রেম,মমত্ববোধ জাগ্রত করা। এ পর্যায়ে শুধু শিশুদের বুদ্ধিমত্তা নয়, আবেগি বিষয় নিয়েও তাদের সতর্ক করা অভিভাবকদের দায়িত্ব।

ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের এক গবেষণায় উঠে এসেছে স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেট নিয়ে বেশি সময় কাটানো শিশু-কিশোরদের দিনে এক ঘণ্টা মোবাইল ফোন ও ট্যাবলেটের টাচস্ক্রিন ব্যবহারের কারণে প্রতিদিন প্রায় ১৫ মিনিটের ঘুম কমে যায়। এসব ডিভাইস থেকে নীল রঙের এক ধরনের আলো বিচ্ছুরিত হয়। যা মানুষের ঘুমানোর সক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। গত ১৫ বছরে এ প্রজন্মের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের বড় কারণ হলো ডিজিটাল মাধ্যমের প্রতি আসক্তি। এর প্রভাবে ব্যক্তির আচার-আচরণ, জীবনযাপনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কেবল ডিজিটাল মাধ্যমের কারণেই যে আত্মহত্যার প্রবনতা বাড়ছে, তাও বলা যাবে না। তবে ডিজিটাল প্রযুক্তি মানুষের মধ্যে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা ,একাকীত্ব তৈরি করছে। ফলে মানুষের আন্তঃসম্পর্ক তৈরি হচ্ছে– একথা ঠিক বটে; তবে সেটি অন্য কোনো মানুষের সঙ্গে হচ্ছে না, বরং হচ্ছে যন্ত্রের সঙ্গে। এর ফলে ভার্চুয়াল যোগাযোগ স্থাপিত হলেও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পারস্পরিক আন্তরিক কিংবা মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠছেনা। নতুন প্রজন্ম গড়ে ওঠছে একেকটি বিচ্ছিন্ন মানুষ হিসেবে। এর ফলে পারিবারিক সম্পর্কও হচ্ছে ভঙ্গুর। পরিবারের বিভিন্ন সদস্য,আতRীয় স্বজনের মধ্যে যে যোগাযোগ সেতু ছিল তা আর আগের মতো নেই। এর অন্যমত কারণ হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি, জীবনের যান্ত্রিকতা, দরিদ্রতা থেকে উঠে আসার জন্য সংগ্রাম, পেশা অথবা কাজে অনেক বেশি সময় দেওয়া কিংবা মা-বাবা উভয়েরই পেশাগত জীবনের ব্যস্ততা। সব শেষে প্রত্যাশা থাকবে নতুন প্রজন্মকে তথা কিশোর,কিশোরী,তরুণ তরুণীদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে,পরিবার,সমাজ,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের ভূমিকা নিতে হবে। একই সঙ্গে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার,শিক্ষা কারিক্যুলামে মানবিক,ধর্মীয় ,সামাজিক,লৌকিক,দেশপ্রেম.মানব প্রেম বিকশিত হওয়ার মতো বিষয়কে অন্তভূক্ত করে নতুন প্রজন্মকে সে অনুযায়ী শিক্ষা দেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

#

লেখক: সাংবাদিক ও সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

পিআইডি ফিচার